বিষ্ণু বসু স্মারক বক্তৃতা

অভিনেতা ও নির্দেশকের সম্পর্ক

পী যূ ষ গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

ধন্যবাদ ব্রাত্যজনকে আজকে এই অনুষ্ঠানে আমাকে বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। ব্রাত্যজন না থাকলে আমার এই স্মৃতি রোমন্থন করার তাগিদ থাকত না। স্মৃতি যে সবসময় সুখের হয় তা নয়, তবে আমি কোনো দুঃখের স্মৃতিতে আজ যাব না। কিন্তু আমি মনে করি, আমার সমস্ত স্মৃতিগুলোই আজকে আপনাদের সামনে আমাকে হাজির করার সাহস দিয়েছে। চন্দনদা এত বললেন আমার সম্পর্কে, তাই আমার খুব ভয় লাগছে যে কীভাবে আমি বক্তব্য রাখব। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা থিয়েটারের যে সামান্য পড়াশুনা আছে মোটামুটি তার ওপরেই বলব। যদিও এরকম কঠিন বিষয়ের ওপর আলোচনা করতে আমার সঙ্কোচ বোধ হয়। কারণ আমি ভালো বক্তা নই। আমার মনের সব বিষয়গুলি ঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারব কি না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই, তবু আজকে আমি চেষ্টা করব। আমি আজ ইতিহাসকেও তুলে ধরব কারণ ইতিহাস না থাকলে আমাদের অস্তিত্ব থাকত না। আজকে এখানে দাঁড়িয়ে যদি কোনো বক্তব্য রাখতে হয় অভিনেতা ও নির্দেশক সম্পর্কে তাহলে আমাকে ইতিহাসকে ছুঁয়ে যেতেই হবে। আমার আজকের প্রশ্ন, আজ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে আদতে কী এই আলোচনার মুখবন্ধটা ঠিক হয়েছে? এটা আমার কাছে আমার প্রশ্ন, যারা আয়োজক তাদের কাছে নয়। প্রশ্নটি হচ্ছে থিয়েটারে শিক্ষক, গুরু, প্রয়োগকর্তা, নির্দেশক—এসবের মানে কি আলাদা? আমি জানি না। একটা সময় বলা হত, শিশিরবাবু-ই হলেন বাংলা রঙ্গমঞ্চের প্রথম প্রয়োগকর্তা। তাহলে তার আগে যাঁরা কাজ করেছেন শিক্ষক হিসাবে বা গুরু হিসাবে তাঁরা কী? আমার কাছে এটা খুব জটিল প্রশ্ন যে, এদের প্রত্যেকটির মানে কী আলাদা? আজকে যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সেটিকে যদি ঐতিহাসিক দিক থেকে ধরা হয় তাহলে দেখা যাবে শিশির যুগ শুরু হওয়ার আগে পরিচালকের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। তাহলে আমাকে অষ্টাদশ শতাব্দীকে একটু ছুঁয়ে যেতে হবে।

প্রথমত, আমি অভিনেতার স্বপক্ষে কিছু কথা বলতে চাই। পর্দা খুলে গেলে মঞ্চে অভিনেতার এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। অর্থাৎ পর্দা খুলে যাওয়ার পর মঞ্চে সেও কোনো অজানা নির্দেশকের ভূমিকা পালন করছে। সংলাপ কেউ ভুল বলল, কেউ বা আলো গার্ড করল, হঠাৎ করে মোবাইল বেজে উঠল বা সহঅভিনেতার সংলাপে হলে হাততালি শুরু হল, তখন কতক্ষণ পর পরিবেশকে স্বাভাবিক করে নিজের সংলাপ শুরু করব তা ঠিক করে অভিনেতা। অর্থাৎ পর্দা খুলে গেলে অভিনেতাও কোনো এক অজানা নির্দেশক হয়ে যাচ্ছে। অভিনেতার মধ্যে শিল্পী ও সমালোচক দুটো সত্তই থাকতে হবে। নাহলে সে সজাগভাবে কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারবে না। আর একটা কথা, যে কোনো মুহূর্তকে আবিষ্কার করার কথাই হল অভিনয়। সেই মুহূর্তটা আদতে সত্য নাও হতে পারে, কিন্তু

তার মধ্যে অভিনেতাদের ঢুকে পড়তে হয়। জীবনের ছোট ছোট উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা একটা বড় জীবন যাপনের দিকে আমাদের ঠেলে দেয়। এবং অভিনয়টা তখনই সত্যি হয়ে ওঠে যখন আমরা বড় জীবন যাপনের দিকে এগিয়ে যাই। অভিনেতার কাজ হচ্ছে, যেটা দর্শক বিশ্বাস করে হলে এসেছেন তার মধ্যে ঢুকে পড়া। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করিয়া ভিতরের লীলা দেখানোর যে প্রক্রিয়া তা হচ্ছে অভিনয়। অর্থাৎ স্বাভাবিকের পর্দা ফাঁক করে ভিতরে ঢুকে পড়তে হবে। আর অভিনয় গুরুর কাছে শিখতে শিখতে আমরা যদি ওই পরশ পাথরটির খোঁজ পেয়ে যাই তাহলে অদ্ভুত সব সৃষ্টি হতে শুরু করবে। অভিনেতাকে জীবনের চারপাশটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। জীবনকে ভালোভাবে না জানলে তার অভিনয়ের প্রকাশ বেশি দুর হবে না। সৎ অভিনেতা কখনো কৃষ্ণ সেজে মানুষকে ধোঁকা দিতে পারবে না, কারণ এটা তার কাজ নয়। তার কাজ সেই সময়কার, সেই চরিত্রটির আবেগকে সত্যতার সাথে প্রকাশ করা। একজন অভিনেতাকে প্রাথমিকভাবে খুব উন্মুক্ত মনের হতে হবে, নিজের গভীরতাকে অনুভব করতে হবে। আমরা প্রত্যেকেই সৎ অভিনেতা। কিন্তু নিজেদের অভিজ্ঞতার সাথে চরিত্রটির মিশেল আমরা যখন করতে পারি না, তখন আমরা খুঁজি একজন গুরুকে। অর্থাৎ সেই অমোঘ উপস্থিতি— পরিচালকের। আজকে আলোচনার বিষয়—"অভিনেতার সাথে নির্দেশকের সম্পর্ক"। আমি যেহেতু মঞ্চ আর পর্দা উভয় জায়গাতে কাজ করি সেহেতু পর্দার একজন বিখ্যাত অভিনেতার একটি ছোট্ট উদাহরণ আনব—চার্লি চ্যাপলিন। কারণ তার অভিনয় জীবনটা শুরু হয়েছিল মঞ্চ থেকে। তার বাবা অত্যন্ত মদ্যপ ছিলেন। তার মা লিলি হ্যারলি মূলত তাদের নাচ, গান, অভিনয়ের দলটি চালাতেন। চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় গুরু হচ্ছেন তার মা। অর্থাৎ তখনও অভিনয়ে নির্দেশকের ভূমিকার প্রসঙ্গটি থেকেই যায়। চার্লি চ্যাপলিনের মায়ের এক অসম্ভব অনুকরণ ক্ষমতা ছিল। ওঁনারা যে বস্তিতে থাকতেন, সেখানে রাস্তার ধার দিয়ে যে সমস্ত লোকেরা যাতায়াত করত তাদের পোশাক, অঙ্গসঞ্চালন, চলার ভঙ্গিমা দেখে চার্লির মা তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতার মাধ্যমে বলে দিতে পারতেন লোকটি বউয়ের সাথে ঝগড়া করে এসেছে না অন্য কিছু ঘটেছে এবং সেটি অনুকরণ করে চার্লিকে দেখাতেন। বস্তির জানলার ধারে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন চার্লি মায়ের ওই মজার খেলাটা দেখেছেন। ওটা তখন চার্লির কাছে ছিল মজার খেলা। কিন্তু পরবর্তীকালে ওটাই হয়ে দাঁড়াল শিক্ষা। চার্লি পরবর্তীকালে বলেন যে, মানব চরিত্রকে খুঁটিয়ে দেখায় যে প্রবণতা সেটা করে তার পরিবেশ। এ ব্যাপারে নিউরোসায়েন্স একটা কথা বলে। আমি 'ব্রেন' নাটকটি করতে গিয়ে কিছু পড়াশুনা করে জেনেছি যে, আমরা ছোটবেলা থেকে যে পরিবেশে বড় হয়ে উঠছি এবং সেখান থেকে সে ডেটা আমাদের মগজে ইনপুট হচ্ছে আমরা সেভাবেই পৃথিবীটাকে দেখব। অর্থাৎ জীবনের রসদটা আমরা জীবন থেকেই অর্জন করব। ছেলেবেলার অসম্ভব যন্ত্রণা ও দারিদ্র্যতা থেকে চার্লি তার জীবনের রসদ খুঁজে পেয়েছিলেন। অর্থাৎ দাঁড়াল যে, অভিনেতা হতে গেলে গুরু, শিক্ষা ও পরিবেশ এবং জীবনের অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। সমাজের প্রতিটি মানুষকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখলে অভিনেতা তার ভাবপ্রকাশ করতে পারবে না। আর সঠিকভাবে ভাবটি প্রকাশের জন্য প্রয়োজন একজন গুরুর।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্লে হাউজে যে নাটক হতো তখন কলকাতার মানুষের সেটা দেখার খুব একটা সুযোগ ছিল না। ১৭৯৫ সালে এজরা স্ট্রিটে প্রথম যে থিয়েটার শুরু হয়েছিল তাতেও কলকাতার লোকজন তেমন মজেনি। ১৮০৮ সালে লেবেডেফ কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন। ১৮৩১ সালে বেলেঘাটার পুঁড়োর বাগানে নব্যশিক্ষিত কলকাতার বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের যে থিয়েটার ছিল, সেটা ছিল সম্পূর্ণ সাহেবি থিয়েটার। ইনি বাঙালিদের নিয়ে ইংরাজি থিয়েটার করতেন। বাঙালি তখন থিয়েটারকে আমল দেয়নি। ১৮৩৫-এ কলকাতা কাঁপালেন নবীনচন্দ্র বসু। বিদ্যাসুন্দর নাটকে মহিলা চরিত্রে অভিনয় করানোর জন্য উনি প্রথম গণিকা পল্লি থেকে অভিনেত্রী সংগ্রহ করে এনেছিলেন। থিয়েটারের দৌলতেই অন্ধকার জগতের মহিলারা প্রদীপের আলোর নীচে দাঁড়ানোর সুযোগ পেল। তাহলে প্রশ্ন নবীনচন্দ্র বসু কে ছিলেন? অন্ধকার জগতের মহিলাদের অভিনয়ে আনা গিরিশবাবুর আগেই তিনি এটা করেন ফলে তার পরিচয়টা কী? ১৮৫৪ সালের 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটকটি বাংলা ভাষায় নাট্যজগতের উৎস মুখটি খুলে দেয় এবং সে সময় কলকাতায় একটি প্রচলিত কবিতা ছিল—

"নিত্য নতুন শুনিতে পাই অভিনয় নাম
অভিনয়ে পূর্ণ হল কলিকাতা ধাম।
হায় কি সুখের দিন হইল প্রকাশ
দুঃখের অন্ত হইল সুখ বারো মাস।
দিন দিন বৃদ্ধি হয় সভ্যতা সোপান,
দিন দিন বৃদ্ধি হইল বাংলার মান।"

এটির রচনাকাল উনিশ শতকের মাঝামাঝি। 'কুলীনকুল সর্বস্ব' নাটকটি পাথুরেঘাটায় রামজয় বসাকের বাড়ি প্রথম অভিনীত হল। এটির হাত ধরেই কলকাতার মানুষ বাংলা থিয়েটারকে গ্রহণ করতে শুরু করে। একটা মজার ঘটনা আছে। এই নাটকে নটীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন একটি ছেলে। তিনি অসম্ভব ভালো গান গাইতে পারতেন। তার খুব ছোট্ট একটা গোঁফ ছিল কিন্তু মঞ্চে নামার আগে ওই যুবকটি কিছুতেই গোঁফটি কামাতে রাজি নয়। মঞ্চের ধারে ক্ষুর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে নাপিত, নাটক শুরু হবে। কিন্তু তাকে বাদ দেওয়া যাচ্ছে না কারণ সে ভীষণ ভালো গান গায়। রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় বললেন 'একটি ছোট কাপড় দিয়ে রুমালের মতো পাকিয়ে নিজের গোঁফের সামনে লাগিয়ে নাচতে নাচতে গানটি গেয়ে স্টেজ থেকে চলে এসো।' সে মহানন্দে গেল আর গানটা গেয়ে চলে এল। এখানে আমার প্রশ্ন, রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় কোথায় থিয়েটারটা শিখেছিলেন? তিনি কী গুরু, না নাটককার, না নির্দেশক? ১৮১২ সালে চিৎপুর রোডে প্রথম হল সাধারণ নাট্যশালা। জমিদার বাড়ি থেকে থিয়েটার সাধারণের মাঝে নেমে এল। গিরিশচন্দ্র ঘোষ থিয়েটারের শুধু একজন নট নন, থিয়েটারের স্থপতি, কবি, সাহিত্যিক। সমাজের অবহেলিত মেয়েদের থিয়েটারের মাধ্যমে শিক্ষিত করে তুলেছেন তিনি। আজকের থিয়েটারে যে ভাবনাটি মূলত হয়, অর্থাৎ নাটকটি নামার আগে যে হলে প্রথম শো-টি হবে স্টেজ রিহার্সাল সেখানেই হয়। এটি প্রথম শুরু করেছিলেন গিরিশ ঘোষ। সে সময় থিয়েটারের নির্দেশক শব্দটির অস্তিত্ব ছিল না। অস্তিত্ব ছিল শিক্ষক শব্দটির। শিক্ষক ও নির্দেশকব শব্দ দুটির তফাৎ কোথায়? উনিশ শতকে বাবু কালচারে বাংলা থিয়েটার যখন প্রায় নিমজ্জমান সে সময় জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি বাংলা থিয়েটারে এক উন্মুক্ত পরিবেশ এনেছিল। ঠাকুরবাড়ির সেই উদার উন্মুক্ত চিন্তা বাড়ির মেয়েদেরও সাংস্কৃতিক কাজে অংশগ্রহণ করিয়েছিল। রবীন্দ্র সে সময় কতটা সমসাময়িক ছিলেন বোঝা যায় তার মন্তব্যে। উনি বলেছিলেন, 'যে দর্শক অভিনয় দেখতে এসেছেন তার কী নিজস্ব সম্বল কানাকড়িও নেই? সে কী শিশু? বিশ্বাস করে কী তার ওপর অভিনয়ের কোনো বিষয়ের জো নেই। তাহলে এদের টিকিট বিক্রি করতে হবে কেন? দর্শকরা তো নিজেদের কল্পনাশক্তিকে বাড়িতে চাবি বন্ধ করে আসেনি! কিছু তুমি বোঝাবে, কিছু তারা বুঝবে। তোমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক এমন আপোষের হওয়া উচিত।'

শিশির যুগে বাংলা থিয়েটারে প্রতিষ্ঠিত হল প্রয়োগকর্তার প্রাধান্য। শিশিরবাবুকেই ইতিহাসে প্রথম প্রয়োগকর্তা হিসাবে স্বীকার করা হয়। তিনিই প্রথম নাটককারের ওপর নির্দেশকের অধিকার প্রয়োগ করলেন। পাঁচ-ছয় ঘণ্টার নাটককে তিনি তিন ঘণ্টায় নামিয়ে আনতেন। তিনি নাটকটি করার আগে সম্পূর্ণ নাটকটিকে সম্পাদনা করে নিতেন। অর্থাৎ এই প্রথম নাটককারের ওপর নির্দেশকের অধিকারটি প্রয়োগ হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং অভিজাত পত্রিকা 'দ্য ড্রামা রিভিউ'-এর সম্পাদক, নাট্যনির্দেশক রিচার্ড সেকনার বলেছেন, পরিচালকের গুরুত্ব কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। আমাদের থিয়েটারে তিনি নেতা, তার দ্বারাই সমন্বয় সাধিত হচ্ছে। এবং অন্যদের সৃজন ক্ষমতাকে মুক্ত করে দেওয়াই হচ্ছে পরিচালকের কাজ। লিখিত নাটক যদি থাকে তাহলে পরিচালক তার প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত থাকতে বাধ্য নয়। রিচার্ড শেকনার তার 'কিং লিয়র' নাটকে তা করেছিলেন। শিশিরবাবু বেশবাস, অভিনয়, দৃশ্যপট, মঞ্চসজ্জা সব কিছুতে এক নতুন যুগের ধারা এনেছিলেন। আগে সংলাপ না থাকলে মঞ্চের ওপর অভিনেতা- অভিনেত্রীরা আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। শিশিরবাবুই এক্ষেত্রে প্রথম বললেন যে, ওই অবস্থায় ভাবাভিনয় দিয়ে দৃশ্যটাকে সাহায্য করতে হবে। অর্থাৎ আধুনিক থিয়েটারে অন্যের সংলাপ শোনার রেওয়াজটা শিশিরবাবুই প্রথম এনেছিলেন। তিনি বলতেন, Blank verse না শিখলে অভিনয়টা ভালো করে শেখা যাবে না। কারণ, নাটকের between the lines লুকিয়ে আছে blank verse-এর মধ্যে যার ওপর জোর দিয়েছিলেন শিশিরবাবু প্রথম। 'দিবারাত্রির কাব্য'-তে আমার প্রথম গুরু অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভীষণ বিপদে ফেলে দিয়েছিলেন একটি দৃশ্যে। তিনি কিছুতেই আমায় বুঝিয়ে

দেননি। বলেছিলেন নিজেকে খুঁজে নিতে। এই প্রসঙ্গে পরে আসব। শিশিরবাবু হৃদয় দিয়ে অভিনয় করতে বলতেন। আমাদের ভারতবর্ষে অভিনয় শেখার অনেক স্কুল আছে কিন্তু অভিনয় শেখার নির্দিষ্ট কী কোনো পাঠ্যক্রম আছে? নেই। তাই পরিচালকদের ওপর, নির্দেশকদের ওপর নির্ভর করতেই হয়। এ প্রসঙ্গে শিশিরবাবুর উক্তি 'ওসব ইসকুল-ফিসকুলে আমি বিশ্বাস করি না। There is only school of acting that is good school of acting।' শিশিরবাবু বলতেন, 'Economy of expression।' সেটা কী? গিরিশবাবুর অভিনয় দেখলে বোঝা যায়। আমার অভিনয়ের বড় প্রভাব হল গিরিশবাবু। গিরিশবাবুকে আমি গুরু বলি তার কারণ এটা নয় যে, তিনি আমায় হাতে ধরে শিখিয়ে দিয়েছেন। তার কারণ, তার অভিনয় দেখে আমি অভিনয় শিখেছি।' অর্থাৎ শিশিরবাবুও কোথাও না কোথাও গিরিশবাবুকে গুরু বলে মেনে নিচ্ছেন। আর আজ ঘটনাচক্রে ব্রাত্যজনের নাট্যউৎসব গিরিশ ঘোষকে নিবেদিত। তাই তার সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলতে পেরে আমারও ভালো লাগছে।

অহীন্দ্র যুগ শুরু হল। তিনি সুপণ্ডিত, পরিচালক। ১৯০৪ সালে অহীন্দ্র চৌধুরি মায়ের সাথে ক্লাসিক থিয়েটারে 'প্রফুল্ল' নাটকটি দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে যোগেশের ভূমিকায় স্বয়ং অভিনয় করেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। আমি একটু আগে বলছিলাম যে, নিউরোসায়েন্সের সাথে অভিনয়ের একটা ভীষণ যোগ আছে। একটি নাটকের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সেটি আমি শিখেছি। memory-র মধ্যে short term memory ও long term memory আছে। দেখুন ১৯০৪ সালে অহীন্দ্রবাবু নাটকটি দেখতে গেছিলেন তার মায়ের সাথে। এর প্রায় ৫২ বছর পর ১৯৫৬ সালে সংগীত নাটক আকাদেমির একটি বুলেটিনে তিনি এই ঘটনার একটি সুস্পষ্ট ও চমকপ্রদ বিবরণ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "It was a thrilling experience of the early age some of tragic scenes are still floating before my eyes, not only with the surface impression of the performances but also with some details expression of that great master" অর্থাৎ তিনি স্বীকার করে নিলেন। তাই শিক্ষক বা নির্দেশক ছিল না তা নয় অর্থাৎ অহীন্দ্রবাবুও গিরিশবাবুকে মেনে নিলেন কোথাও অভিভাবক বা গুরু হিসেবে। ১৯০৪ সালে থেকে এটি তার long term memory-তে থেকে গিয়েছিল। তাই ৫২ বছর পর তিনি এর উল্লেখ করেছিলেন।

শম্ভু মিত্র এলেন এরপর। শম্ভু মিত্র বলতেন, হাতেনাতে সমস্ত কাজ করতে করতে সৃজনের সমস্ত খুঁটিনাটি জেনে নিতে হবে। বেশভূষা, মঞ্চসরঞ্জাম, মহলা কক্ষ পরিষ্কার রাখা, হিসাব রাখা—সমস্ত কাজ দলের ছেলেমেয়েরাই করবে, যাতে নাট্যশিল্পের পরিচ্ছন্ন রূপটা তারা নিজেরাই চিনে নিতে পারে। উনি বলতেন, সাধারণত যারা অভিনয় করেন তারা মোটা গলায় সংলাপ বলতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাতে তাদের ব্যক্তিত্বটা প্রকাশ পায় না। ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পায় কণ্ঠের বিস্তৃতিতে। এ ব্যাপারে একটি মজার গল্প আমি বলে থাকি। ধরা যাক, ল্যান্ড লাইনে আমার বাড়িতে একটা ফোন এল। ফলে আমি দেখতে পাচ্ছি না যে কে ফোন করেছে। শম্ভুবাবুর কথাটি কেমন মিলে যাচ্ছে? আমি ফোন ধরে গম্ভীর গলায় বললাম 'হ্যালো'। আর ওপাশ থেকে উত্তর এল 'আমি সত্যজিৎ রায় বলছি। আমার ছবিতে আপনার প্রয়োজন আছে।' সঙ্গে সঙ্গে আমার গলা নিচের সা থেকে ওপরের সা-এ চলে গেল। গম্ভীর গলা নিমেষে পাতলা হয়ে গেল। যদিও বিষয়টি কাল্পনিক এবং আমার ভনিতা ও অসততা নিমেষে ধরা পড়ে গেল। অভিনয় জগৎ মানুক না মানুক এই জগতে গুরু-শিষ্য পরম্পরা চলবে। অভিনয়ে বিশেষ করে গুরুর প্রয়োজন। কারণ এর নির্দিষ্ট কোনো পাঠক্রম নেই তাই একজন অভিনেতা তার শেষ বয়স অবধি অভিনয়টা শিখেই চলে। এখানে যারা পরিচালক বসে আছেন তাদের কাছে তাই কিছুটা অন্যরকম শোনালেও, যদিও এটা আমার কথা নয় শিশিরবাবু বলেছেন, গুরুর গৌরব তখন, যখন উপযুক্ত ছাত্র পাওয়া যায়। গুরুর সৃষ্টিকে ইতিহাসের কাছে বাঁচিয়ে রাখার জন্য তাই যোগ্য শিষ্যের অবদান অনস্বীকার্য। শিষ্য বিনা গুরুর কোনো অস্তিত্ব থাকে না। ব্রাত্য এই প্রসঙ্গে একটি কথা লিখেছিলেন সেখান থেকে বলছি—'এটা স্মরণ রাখি যেন মারিওপুজো তার 'গডফাদার'-এ বলেছিলেন, একজন প্রকৃত মানুষ এটাই চাইবে যে, তার বন্ধুরা যেন তার গুণ কমিয়ে দেখে আর শত্রুরা যেন তার দোষ বাড়িয়ে দেখে।' অভিনেতাকেও যারা খুঁচিয়ে তার থেকে ভালো কাজ বার করে নেবে তারাই হচ্ছে তার বন্ধু অর্থাৎ পরিচালকেরা। তাই বোঝা যাচ্ছে, পরিচালক বা নির্দেশকের

সাথে অভিনেতার সম্পর্ক বিশ্বস্ত বন্ধুর সম্পর্ক হওয়া উচিত। এখন থিয়েটারে নির্দেশকের উপস্থিতি আরও অমোঘ হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ থিয়েটার এখন অনেক আধুনিক পর্যায়ে পৌঁছেছে। থিয়েটারে স্ক্রিপ্ট, আলো, শব্দ, মেক-আপ, মঞ্চসজ্জা অভিনয়—সবকিছুই একে অপরের সাথে সংযোগ সাধন না করলে নাটকটি সুন্দর বা পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করবে না। এতগুলি উপাদানকে একসাথে যিনি নিঁখুতভাবে মিলিয়ে দেন তিনিই হলেন নির্দেশক। এই উপাদানগুলি মিশিয়ে নির্দেশক বা পরিচালক একটি audio-visul character তৈরি করবে যাকে দেখবে দর্শক। প্রতিটি শো-এর আগে পরিচালকেরা cheer-up করেন যেমন ফুটবল খেলার আগে কোচ পি. কে. ব্যানার্জি ভোকাল টনিক দিতেন। তাই পরিচালক বা নির্দেশকের প্রয়োজন আছে ও থাকবে। পদ্মফুলের পাপড়ি ধীরে ধীরে খুলে যাওয়ার পর ভেতরের আসল সৌন্দর্য যেমন উন্মোচিত হয় তেমনি অভিনেতাও একটি চরিত্রের গভীর থেকে গভীরতর স্তরে পৌছে যায়। পরিচালকের সাথে তার এই বুনন তৈরি হয় নাটকের রিহার্সাল থেকে। ফলে ব্যক্তিগত জায়গা থেকে দুজনের মধ্যে আদানপ্রদান হওয়াটা জরুরি। এখানে মান-অভিমান, অসম্মান, বকাঝকা—সবকিছুই হতে পারে। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যদি দুজনের একে অপরকে জানা থাকে তাহলে আরও সহজ হয়ে যায়। সিনেমায় যে টপ অ্যাঙ্গেল শট থাকে মানে ওপরে যে ক্যামেরা থাকে যেখান থেকে পুরোটা দেখা যায় আমি মনে করি, থিয়েটারের নির্দেশক হচ্ছেন সেই টপ অ্যাঙ্গেল ক্যামেরা। তার চোখে পুরো চিত্রটা সম্পূর্ণভাবে ধরা আছে। তাই অভিনেতাকে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। সেটা আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে অবশ্যই নয়। পরিচালককেও বুঝতে হবে অভিনেতার 'sensibility'টা। এক একজন পরিচালক এক একরকমভাবে অভিনেতাকে উসকে দেওয়ায় কাজটা করে থাকেন। আর শিশিরবাবুর কথায়, পরিচালকদের প্রয়োজন সেই উপযুক্ত ছাত্রদের যারা পরিচালকের অস্তিত্বকে, মহিমাকে বাঁচিয়ে রাখবে যুগের পর যুগ। পর্দা খুলে যাবার পর যখন পরিচালককে চাক্ষুস দেখা যায় না।

১৯৮০ সালে অ্যাক্সিডেন্টে আমার কোমরের হাড় ভেঙ্গে গেল। তার আগে ফুটবলে আমার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করা হয়ে গেছে। কিন্তু যেহেতু আমি গোলকিপার ছিলাম সেহেতু আমার মাঠে ফেরা সম্ভব হল না। চিরকালই আমি একটি কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকার লোক নই। অনেকগুলো কাজ একসাথে করার স্বভাব আমার বরাবরই ছিল। তাই বলে কখনও ভাবিনি অভিনেতা হবো। খেলাটা চলে যাওয়াতে আমার মন খুব খারাপ হয়ে যায়। সংস্কৃতিপ্রবণ তেমন ছিলাম না। তাই আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে এখন যে তাত্ত্বিক কথাগুলো বলছি তা ভাবা তখন প্রায় অসম্ভব ছিল। বেহালা হাইস্কুলে আমি পড়তাম। সেই স্কুলের ১০০ বছর পূর্তির অনুষ্ঠানে সেবাস্টিয়ানের 'শেষ সংবাদ' নাটকটি অভিনীত হয়েছিল। তখন পাড়ায় নাটক-ফাটক করছি। এখন ফাটক বললে রেগে যাই। এই নাটকটিতে মূল সাংবাদিক চরিত্রে অভিনয় করানোর জন্য আমায় নিয়ে যাওয়া হল। বেহালা হাইস্কুলে ছাত্রদের মধ্যে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিরা ছিলেন। অনেক অভিনয়, হাস্যকৌতুক অভিনয়ে তাকে দেখেছেন সমীর মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। উনি একসময় 'চেতনা'র সদস্য ছিলেন। সুবিমল রায় 'চেতনা'র প্রেসিডেন্ট ছিলেন। 'মারীচ সংবাদ'-এ জমিদারের অভিনয় করতেন এবং অন্যান্য নাটকেও। তাঁরাও স্কুলের সাথে যুক্ত ছিলেন। নাটকটি হয়ে যাওয়ার কিছুদিন পর এক রবিবারে সুবিমল রায় আমার বাড়িতে এলেন। প্রতি রবিবার তখন আমার বাড়িতে লুচি-তরকারি হত। তখন আমার খুব রাগ হতে শুরু করল কারণ প্রতি রবিবার আসার ফলে লুচি ভাগ হতে শুরু করল। অথচ তিনি কিছু না বলেই চলে আসছেন। তখন আমার বিয়ে হয়ে গেছে। লোকে বিয়ের পর অভিনয় ছাড়ে আর আমি বিয়ের পরে অভিনয়ে ঢুকেছি। তারপর একদিন আমাকে বললেন যে, 'তুমি নাটক করবে চেতনা'য়?' কিন্তু তখন আমি 'চেতনা' কি তা জানতাম না। সাংস্কৃতির বিষয়ে এতোই অচেতন ছিলাম। আমি বললাম, 'না, থিয়েটার আমি করব না। উনি বললেন, 'সপ্তাহে তিনদিন—সোম, বুধ, শুক্র। সন্ধ্যে সাড়ে ছ'টা থেকে।' আমি তখন মনে মনে ভাবলাম অসম্ভব, কারণ তখন ওটা ছিল আমার আড্ডার সময়। আম্যদের পাড়ায় থাকতেন শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর পুত্র দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত। তখন তাদের 'গাব্বুখেলা' নাটকটি খুব হিট। আমি একদিন দীপেনদার বাড়ি গেলাম এবং বললাম, আমায় 'চেতনা'য় অভিনয় করতে বলছে। শুনে দীপেনদা আর উৎপলদা খুব বিশ্রী হেসে বললেন, 'তুই অভিনয় করবি? জানিস, 'চেতনা' এই মুহূর্তে একটা বড় দল। আসলে

তোর চেহারা ভালো তো তাই নিয়ে গিয়ে ঝাড়-টাড় দেওয়াবে।' আমি পরে সুবিমলদাকে এই কথা বলতে উনি বলেন, ব্যাপারটা খুব সিরিয়াস। কারণ উৎপল দত্ত তখন সবে রাশিয়া থেকে ফিরেছেন। তখন আলেকজা রাশিয়াতে। তবে আমাদের এখানে এই ধরনের নাটক তখন অতটা গ্রহণযোগ্য হয়নি। উনি বললেন, ওই নাটকে আমায় মূল চরিত্রে অভিনয় করার কথা বলেছেন অরুণ মুখোপাধ্যায়। তোমায় তখন তো আমার আরও অবিশ্বাস। কিন্তু সুবিমলদা বললেন, তোমায় দেখা করতে বলেছেন অরুণবাবু। ওই প্রথম আমার কোনো থিয়েটার দলে যাওয়া। ১৯৮৮-র ২৭ মার্চ আকাদেমিতে 'জ্যেষ্ঠ পুত্র'র প্রথম শো হয়েছিল সকালে। এবার 'নির্দেশকের সাথে অভিনেতার সম্পর্ক'-এ আমি ঢুকছি। অরুণবাবু রিহার্সাল ছাড়া একটু গান-বাজনাও করতেন। সেই প্রথম আমি আস্তে আস্তে আবিষ্কার করলাম যে, নির্দেশক কী? আমি সেই সময় সৌভাগ্যবশতঃ তিনজন বড় অভিনেতাকে পেয়েছিলাম—নন্দিতা রায়চৌধুরী, বিপ্লবকেতন চক্রবর্তী এবং শিবপ্রসাদ ঘোষ। আমি এদের থেকে প্রচুর কিছু শিখেছি। যাই হোক, একদিন রিহার্সালের সময় অরুণদা অনবরত আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মুভ করছেন। আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন, তিনি এতটাই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন তখনই ক্যামেরার দিকে না তাকিয়ে হঠাৎ সেই মুহূর্তে তারই চোখই যেন ক্যামেরা, অভিনয় করার কথা আমায় বলেছিলেন। পরে একদিন সেট লাগাতে যাই নি বলে খুব বকাও খেয়েছিলাম। ঘটনাটা ঘটেছিল কে.সি. দাসের বাড়িতে, ওঁনার সামনেই অরুণদা বলেছিল, হিরোর রোল করছ বলে কি সেট লাগাতে যাবে না? খুবই অপমানিত হয়েছিলাম কিন্তু শিখেছিলাম তাই আজ বলতে পারছি। আর একদিন রিহার্সালে পাঁচ মিনিট দেরিতে পৌঁছেছি। চালাকি করে ঘড়ি পাঁচ মিনিট স্লো করে দিয়েছিলাম। জিজ্ঞেস করলেন, এত দেরি কেন? আমি বললাম, 'এই তো সবে সাড়ে ছ'টা বাজে।' উঠে এসে সপাটে এক চড়। বললেন—'ঠিক করে মিথ্যে বলার অভিনয়টাও করতে পারিস না। ধরা পড়ে যাচ্ছে তোর মুখে। ঘড়ি তো স্লো করে ঢুকেছিস।' চেতনাতেই কাজের সুযোগ হয়েছিল সুমন মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় 'ডাইন' বলে একটি নাটকে। 'নয়ন গুনমান' নামে একটি ওঝার চরিত্রে। লাল মনে করত, নির্দেশক সবজান্তা নন, মঞ্চভাবনা, ব্লকিং ভেবে আসত না। অভিনেতাকে স্বাধীনতা দিত চরিত্রটাকে রূপ দিতে। তো সেই স্বাধীনতাকে নিয়েই আমি মঞ্চে প্রবেশ করতাম। আর্দ্যা স্ত্রোত্র কায়দা করে নিজের মতো বলে। এটা ছিল খুব মজার ব্যাপার।

এবার বিভাস চক্রবর্তী। পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির প্রথম প্রযোজনা ছিল 'চৈতালী রাতের স্বপ্ন'। দ্বিতীয় প্রযোজনা 'বলিদান'-এ আমি দলভিত্তিক ইন্টারভ্যিউয়ের চেতনা থেকে নির্বাচিত হয়েছিলাম। বিভাসদা নির্দেশনায় আসার পর থিয়েটারের সামগ্রিক প্রয়োজনে আমায় 'মাধব মালঞ্চ কইন্যা'-য় প্রায় চৌত্রিশটা শো করতে হয়েছিল। কিন্তু প্রথম শোক (২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯০, ম্যাটিনি, সেনিদ ছিল দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর দিন।) হয়েছিল ভয়ংকর খারাপ। কারণ সুরঞ্জনা (দাশগুপ্ত)-র ব্যস্ততার কারণে ওঁনার সঙ্গে আমার কোনো মহলাই হয়নি। গান আমি জানতাম কিন্তু মঞ্চে ডানদিন বাঁদিক বুঝিয়েছিলেন 'মালঞ্চী' হয়ে শ্রী সনৎ দত্ত। সুতরাং প্রথম ম্যাটিনি শো- তে আমি যাকে বলে ব্লান্ডার করলাম। নির্দেশক বিভাস চক্রবর্তী ম্যাটিনি শো-র পরে বললেন, 'দোষ তো ওর নয়, দোষ আমাদের। আমরা ওকে রির্হেসাল দেওয়াতে সময় পাইনি।' এই হচ্ছে বন্ধুবৎসল গুরুসম পরিচালক—২৩শে সেপ্টেম্বর ৬.৩০টার শো আর পরেরদিন ২৪শে সেপ্টেম্বর ডবল শো থেকে আর ভুল হয়নি।

'ভুল' একটা হয়েছিল থিয়েটারের ওই সামগ্রিক প্রয়োজনে, একটি দলকে তাদের প্রযোজনার ধারাবাহিকতা বজায় বজায় রাখতে সাহায্য করে অন্য কোনো চরিত্রে/যা আমার নিজের নয়। তাতে অভিনয় করে ওই সামগ্রিক থিয়েটারের শোগুলিকে বাঁচিয়ে দেওয়া। কিন্তু সেটা অন্য নিরিখে বড় ভুল ছিল। যাইহোক, 'স্মৃতি সততই বেদনার'। এরপর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা অবলম্বনে নাটক 'জোছনা কুমারী' করার পর আস্তে আস্তে লোকে চিনতে লাগল আমায়। নাটকটির একটি মূল চরিত্রটি একজন বি.এস.এফ. কমান্ডারের। একা থাকে। বোন ধর্ষিত হয়ে মারা গেছে। কিন্তু লোকটি প্রেমিক। কিন্তু সেই জায়গাটা আমি ধরতে পারছিলাম না। বিভাসদা বললেন যে, সে গাছ ভালোবাসে, পাখি ভালোবাসে তাতেও তো প্রেম হয়। এর মধ্য দিয়ে তিনি ক্লু দিলেন। একদিন রিহার্সালে ডান দিকের ওপরের লাইটের দিকে তাকিয়ে মনে হল, গাছে একটা পাখি বসে আছে। আমি পাখিটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'যাঃ, পালিয়ে গেল'। বিভাসদা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী এটা?' আমি বললাম, 'ও পাখির সাথে কথা বলে। এটা কী করব?' বিভাসদা বললেন, 'করো'।

পরমজিত সিং-এর প্রেমিক ভাবটা প্রকাশ পেল কোথাও একটা। এগুলো হচ্ছে নির্দেশকের অভিনেতাকে উস্‌কে দেওয়া। এও মনে আছে একদিন আসানসোলে কল শো-এর পর দর্শকরা আমার অটোগ্রাফ নিচ্ছেন, দিলীপদা আমাকে বাসে ওঠার জন্য তাড়া দেওয়াতে বিভাসদা বলেছিলেন, আরে ওকে আর একটু সময় ছেড়ে দাও। সই-টই দিক, ছবি-টবি তুলুক। এটাও বোধহয় অভিনেতা ও নির্দেশকের সম্পর্কের একটা বড় দিক তুলে ধরে। আমার আর এক গুরু, নির্দেশক ছিলেন সীমা মুখোপাধ্যায়। তিনি আবার ভীষণ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতেন। এবং উলটো প্রশ্ন করে জেনে নিতেন যে, আমি সঠিক অবস্থানে আছি কিনা, তার 'বিকল্প' নাটকে।

এরপর অসিত মুখোপাধ্যায় বিভাসবাবুকে অনুরোধ করেছিলেন 'আকরিক' নাটকের জন্য। আর তখন বিভিন্ন দলগত কারণে এতটাই মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলাম অভিনয়ের দিক থেকে ওই একটি ভুলের জন্য যে আমি বিভাসদাকে ছেড়ে আর কারোর কাছে যেতে চাইনি। অসিতবাবু দুবার বলেছিলেন। এরপর বিভাসদা একদিন আমায় বললেন, 'উনি যখন চাইছেন তখন তুমি যাও নাটকটা করো, কোনো ভয় নেই।' ১৯৯৫-তে 'আকরিক' করি কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ নাটকটির উনিশটি শো করে 'আকরিক' থেকে আমি সরে আসি। তবুও আমি নির্দ্বিধায় বলতে পারি আধুনিক অভিনয় কী? বাড়াবাড়ি না করেও ভালো অভিনয় যে করা যায় অসিতদার কাছ থেকে শিখেছি। রমাদা কীভাবে চরিত্রটার মধ্যে ঢুকে চরিত্রটাকে বার করে নিতে হয় সেটা শিখিয়ে দিলেন। অসম্ভব ভালো মানুষ ছিলেন। সত্যিকারের গুণী মানুষ বোধহয় বেশিইদন থাকেন না। অরুণদা প্রসঙ্গে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। তিনি কিছুতেই দেখিয়ে দিতেন না। অভিনেতাকে নিজেই চরিত্রটাকে বের করে আনতে সাহায্য করতেন। তাই হেরম্বের blank verse তিনি দেখিয়ে দেননি। অথচ আমি প্রথম শোর করার পর আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'তুই যে হেরম্ব করছিস, তার মুখে থেকে যে blank verse বের হবে সেটাই তোর। তাই আমি দেখালে ওটা আমারই হতো তোর না'। এরপর থিয়েটার থেকে ছ'বছরের নির্বাসন।

তারপর ২০০৩ সালে রবীন্দ্রসদনে সাদা পাজামা- পাঞ্জাবি পরে ব্রাত্য বসুর সাথে দেখা। বললেন 'তোমাকে খুঁজছি। একটা নাটক করতে হবে।' হল 'ভাইরাস এম'। করলাম নীলাঞ্জন চরিত্রটি। সে আর এক অভিজ্ঞতা। এমন পাগল পরিচালক বা নির্দেশক আমি আগে কখনও দেখিনি। প্রতিটি সংলাপ এমনকি দাড়ি-কমা পর্যন্ত মনে রাখে। আর ভুল হয়ে গেলেই বকুনি। 'ভাইরাস এম'-এর নীলাঞ্জন-এর অভিজ্ঞতা ভোলা প্রায় অসম্ভব। তারপর '১৭ই জুলাই' নাটকের সমস্ত ভুল-ত্রুটি গড়াতে গড়াতে সেটা আকাদেমির বাইরের চায়ের দোকান অবধি যেত। শো-তেই সে এক অস্থির কাণ্ড। এক শব্দ ভুল মানে ব্রাত্যর মাথায় চারটে চুল চলে যাওয়া। প্রথম সারিতে বসা তারপর ভুল হলে উঠে যাওয়া। গ্রীণ রুমে হাফ টাইমে বারণ কার সত্ত্বেও আমার ভুল ধরাবেই এবং স্বাভাবিক সেই ভয়ে সেকেণ্ড হাফেও ভুল। সেটা চলত বাইরে চায়ের দোকান অবধি। এমনকি রাতে ফোনেও। একদিন শো-তে মাথা ফাটল। সেদিন মানসী সিনহা এসেছিল। আমার মাথা ফাটা ওর চোখে পড়ল না। আমার সেদিনের ভুলটাই ও উল্লেখ করল আমার মাথা অবস্থায়। আমায় পি.জি.-তে নিয়ে যাচ্ছে পৌলোমী ও দলের অন্যান্য তখন ব্রাত্য বলছে, 'আজও সংলাপে তুই ভুল করলি'। আপনারা ভাবুন কতটা প্যাশোনেট পরিচালক হলে এটা করা যায়। রাতে ফোন ব্রাত্যর। ও বোধহয় মাসিমার কাছে খুব বকা খেয়েছিল। আর আমি পেয়েছিলা মাসিমার কাছ থেকে উপহারস্বরূপ একটা জামা। জামাটা আজও রাখা আছে। যেমন ব্রাত্য আজও তেমনি অবিকল এমনটা আজও চলছে। ব্রাত্য মানুষটা পাল্টে গেলে আমার ভালো লাগবে না।

'বাবলি' নাটক ব্রাত্যর লেখা। পরিচালক ছিলেন অনির্বাণ ভট্টাচার্য। অনির্বাণ ভীষণ সেনসিটিভ একজন পরিচালক এবং খুব নরম মনের মানুষ। আমি ভাবলাম, এবার এতো ভুল খুঁটিয়ে ধরার কেউ নেই। কিন্তু না, দুদিন যেতে না যেতেই সেখানেও ব্রাত্যর উপস্থিতি এবং সেই একই ঘটনা চলতে থাকল, একই শিক্ষাপদ্ধতি এবং আমার শেখা।

তারপর আর একটি কঠিন ন্যাটক, সেটি বোঝা আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। তা হল 'মৃত্যু ঈশ্বর যৌনতা'। নাটকটি বুঝে তার সঙ্গে দর্শকদের সংযোগ সাধন করানো যে কোনো অভিনেতার পক্ষে কঠিন কাজ। কিন্তু ব্রাত্যর নির্দেশনায় সেই কঠিন কাজটা আমি সাফল্যের সঙ্গে উতরে গিয়েছিলাম। আর একটি নাটকে (সিনেমার মতো) রিহার্সালে ব্রাত্যর বাড়ি যেতে দেরি হয়েছিল

বলে শুভায়ন ফোনে আমায় জানায় সেদিন আমায় আসতে হবে না। অভিমানে চিঠি লিখে ওর বাড়িতে সিকিউরিটি গার্ডের হাতে গভীর রাতে দিয়ে আসি। তারপর আবার মান-অভিমান ভেঙ্গে কাছে ডেকে নেয়। এই ঘটনাটা আজও আমি শিক্ষার্থী হিসেবে অনেককেই বলি। তাতে অনেকেই আমায় বলেছিলেন, 'পীযূষ গাঙ্গুলি' এটা মেনে স্থানে 'আজ' আর নেই। কিন্তু আজও যখন যে কাজটা করি নিজেকে ছাত্র ভেবেই করি। সে আমার যতই আত্মবিশ্বাস থাক না কেন? আমার মুখস্থ হচ্ছিল না কিন্তু স্ক্রিপ্টে আমার লাইনগুলো হাই-লাইটার দিয়ে মার্কিং করা ছিল। তাতে ব্রাত্য বলল, হাইলাইট করে আমায় দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। লজ্জায় পরের দিন হাইলাইটার দিয়ে মার্কিং ছাড়া একটা ফ্রেশ স্ক্রিপ্ট নিয়ে গেলাম। এবং মুখস্থ তাড়াতাড়ি হল। এটাও একটা শিক্ষা পদ্ধতি। ব্রাত্যকে ভীষণ ভয় পাই পরিচালক হিসেবে কিন্তু ভীষণ শ্রদ্ধা করি একজন প্যাশোনেট মানুষ হিসেবে। দেবেশ চট্টোপাধ্যায়ের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা হল, কোনো কিছুতেও স্ট্যাটিক থাকে না। শেষ দিন পর্যন্ত নতুন কিছু করতে করতে যায়। আর একটা মজার ব্যাপার হল, অভিনেতা মঞ্চে ভুল করলে পরিচালক নিজে এসে ভুলটার বিশ্লেষণ করে তার একটা অন্য মানে বের করে। দেবেশের মঞ্চে dimension সম্পর্কে অসম্ভব ভালো ধারণা আছে। আর জ্যোতিস্মান চট্টোপাধ্যায়ের সাথে কাজ করতে গিয়ে বুঝেছি অসম্ভব সেন্স অফ হিউমার আছে ওর। এরপর 'গ্যালিলিও গ্যালিলে'-তে বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ। একটি দৃশ্য হয়তো নাটকে নেই কিন্তু শুধু composition-এর ওপর ভিত্তি করে সেটিকে দৃশ্যতঃ করে তোলে বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চসজ্জার মধ্য দিয়ে স্ক্রিপ্ট খুঁজে নিতে পারে বিপ্লব—সেটা আমি দেখেছি। আর জ্যোতিস্মানের মতো বিপ্লবও ভুলটাকে মজা করে ধরিয়ে দেয় যেটা খুব লজ্জার। এই হল নির্দেশকদের সাথে আমার সম্পর্ক যারা আমার গুরু। আজ এই সুযোগে তাদের সকলকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাতে পারলাম। আর এই কারণে অনেক ইন্টারভিউতে যখন প্রশ্ন করে যে, 'এতদিন ধরে আপনি অভিনয় করছেন। কিন্তু আপনার নির্দিষ্ট কোনো স্টাইল বা ঘরানা নেই কেন বা ধরা পড়ে না কেন?' আমি বলি, কোনো নির্দিষ্ট গুরুর কাছে কেউ যদি গান শেখে তাহলে একটি নির্দিষ্ট ঘরানা ধরা পড়ে। কিন্তু আমায় যখন যে পরিচালক যে পাত্রে রাখে তখন আমি সেই পাত্রের আকার ধারণ করতে পারি। পরিচালক হিসাবে এদের না পেলে আমি মনে করি, আমি যতই বুদ্ধিমান বা পরিশ্রমী অভিনেতা হই না কেন আমি নিজেকে নিজে দেখতে পেতাম না বা নিজের ভুল-ত্রুটি সংশোধনের সুযোগ পেতাম না। তাই সব গুরুদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে এখানেই বক্তব্য শেষ করলাম।